মরা গাঙ্গে বান

যুথিকা বড়ুয়া

(১)

ছোটুর মুখের দিকে তাকালেই দুঃখে বুকটা ফেটে যায় প্রমিলার। কপাল চাপড়ে বিলাপ করে ওঠে,-“হে ভগবান! কোন্ কুক্ষণে যে পোলাডা জন্ম গ্রহণ করছিল, অড়ে ক্যান্ এত্তো বড় স্বাস্তি তুমি দিলা!”

ছোটুর জন্ম থেকেই চোখদু’টো ট্যাঁড়া, ঠোঁট কাটা। নাকটাও প্যাঁচার মতো বোঁচা। একেবারে নেই বললেই চলে। কথা বললে নাকে নাকে শোনায়। দাঁতগুলি যেমন মুক্তার মতো সাদা, তেমনি কয়লার মতো কুচকুচে কালো গায়ের রং। বীভৎস চেহারা ওর। দিনের বেলাই লোকে দেখলে ভয় পায়। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা সবাই ওকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করে। ক্লাসের কেউ বসতে চায়না ওর পাশে। খেলতেও নেয় না কেউ সঙ্গে। দেখলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে সবাই দূর দূর করে তাড়ায়। তখন বাচ্চা ছেলের মতো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে নাকে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে মায়ের কাছে এসে নালিশ করে। ব্যস, তখন মরার উপর পড়ে খাড়া। এসব সহ্য হয় কখনো! একেই অভাব অনটনের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সারাদিন মানসিক অশান্তিতে কাটে প্রমিলার। রাত পোহালেই ওর চিন্তা, কখন চূলোয় হাঁড়ি চড়বে, রান্না বসবে! ঘরে আনাচ থাকে তো চাল-ডাল থাকে না, তেল থাকে তো মশলাপাতি থাকে না। চিবোতে হয় শুকনো রুটি। কোন কোনদিন তাও জোটে না। এমতবস্থায় মাথা ঠান্ডা থাকে কারো! ছোটুকে কাঁদতে দেখলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় প্রমিলার। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে ওঠে,-“হইছে কি তড়? কান্দস ক্যান? রোজই কাইন্দ্যা কাইদ্যা বাড়ি আসস! তগো মাষ্টারগুলা কি অন্ধ! চোখে দ্যাখে না! হ্যাগোর আস্কারা পাইয়াই তো বিয়াদপ পোলাপাইনগুলা কাউরে ডরায় না! তড় মা-বাপ কি মইরা গ্যাছে? ছ্যামরাগুলা পাইছে কি! আমাগো গ্যারাম পঞ্চায়েতও হইছে একখান্ ডাকাইত! গরীব মাইনষের রক্ত চুইস্যা খাইতাছে, কামের বেলায় নাই! নালিশ করলে উল্টা আমাগোই ধমকায়! গরীব বইল্যা আমাগো মূইল্যই নাই! মানুষটা কত্ত কষ্টে পোলারে ইস্কুলে দিছিল, অড়ে ল্যাখাপড়া শিক্ষাইবে, মানুষ করবে, বাপ-মায়ের দুঃখ দূর করবে! এহন দুইমাসও হয় নাই, ছ্যামড়াগুলা জ্বালাইয়া খাইতাছে! আর হইব কুনদিন পোলার ল্যাখাপড়া! যাইব গিয়া রসাতলে! হ্যাগোর কি, হ্যাড়া ত্যালার মাথায় ত্যাল ঢালব, পকেট ভরাইব নিজেরার আর মরবে ঐ গরীবগুলা!”

সারাদিন বকতে বকতে চোখমুখ গর্তে ঢুকে গিয়েছে প্রমিলার। চিন্তা-ভাবনায় শরীরটাও অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। হাঁড়গুলিসব কঙ্কালের মতো বেরিয়ে এসেছে। রাতে যাও একটু ঘুম হতো, এখন সেটাও গেছে উধাও হয়ে। এদিকে সংসারের টলমল অবস্থা। নিজের সাধ-আহালাদ তো দূর, ভালো-মন্দই জোটে না কপালে। ওদিকে গরুর বাছুর বেচে দিয়ে ছেলের মনোরঞ্জনের জন্য হরিপদ কালার টি. ভি কিনে নিয়ে এসেছে। ছোটু বাড়িতে বসেই লেখাপড়া করবে, পড়ার শেষে টি.ভি দেখবে! সঙ্গী-সাথির প্রয়োজনই হবে না! এছাড়া উপায় কি! সামর্থ থাকলে দূরে কোনো বোডিং-স্কুলে ভর্তি করে দিতো। এতো জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। অন্তত একটু শান্তিতে থাকতে পারতো। এমন সৌভাগ্য কি কপালে ধরবে কোনদিন প্রমিলার! বাপ-দাদার আমলের ভিটে বাড়ি সহ সামান্য জমিটুকুই একমাত্র সম্বল হরিপদর। তার মধ্যেই আনাচপাতীর চাষ করে। উৎপন্ন ফসলের বেশীরভাগই বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু তাতে ক’পয়সা আর উপার্জন হয়! এত বড় সংসার, কূলোয়ও না! স্ত্রী-পুত্র ছাড়াও বিধাব মা প্রভাবতী দেবী, বিকালঙ্গ ভাই নিকুঞ্জ ও ছোটবোন রমলা, এদের সবার দায়-দায়িত্ব মাথার উপর চেপে আছে। অথচ গায়ে-গতোরে বিশাল চেহারা নিকুঞ্জর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওর হাত-পাগুলি জন্ম থেকেই ব্যাঁকা। ক্র্যাচ্ ছাড়া

চলতে পারে না। ভারী কাজ ওর সাধ্যের বাইরে। হরিপদর একার রোজগারে ছ'জনের অন্ন জোগাতে অনেক কষ্ট করতে হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। তবু কোনরকমে দিন চলে যাচ্ছিল। কোনো অশান্তিই ছিল না। একমাত্র ছোটুকে নিয়েই হয়েছে যতো জ্বালা। কিন্তু ওরই বা আর দোষ কি! বয়সের তুলনায় বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ এখনো ঘটেনি। অত্যন্ত চঞ্চল। এক জায়গায় কখনো সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। ঘরে বাইরে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হয়, গঞ্জনা শুনতে হয়। সারাদিন ভ্রমরের মতো আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস। বাধ্যগত ছেলের মতো ঘরে বসে থাকা, বড়দের অনুসরণ করে চলা, ওর ধাতে নেই। তা'ছাড়া একনাগারে টি.ভি দেখতে কতক্ষণ আর ভালো লাগে! ওদিকে প্রহরীর মতো কড়া নজরে পিসি রমলা দরজার গোড়ায় পাহাড়া দিয়ে বসে থাকে। ঘর থেকে বের হলেই দেবে ওর ঠ্যাং ভেঙ্গে। কিন্তু কতক্ষণ, একসময় অধৈর্য্য হয়ে দরজার শিখল তুলে দিয়ে রমলা চলে যায় রান্নাঘরে। তখন ও' চিল্লিয়ে ওঠে। -"দরজা খোলো, দরজা খোলো!" বলে খুব জোরে ধাক্কা দিতে থাকে দরজায়।

এ আর নতুন কি! রাত পোহালেই প্রতিদিন একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি। সাত-সকালেই উৎপাত-উপদ্রপ, চিৎকার-চেঁচামিচি আরম্ভ করে দেয়। মাথা একেবারে চিবিয়ে খায়। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে রমলার। রি রি করে। ইচ্ছা হয়, ছোটুর ঘাড়টা মটকিয়ে দিতে। শেষাব্দি অতিষ্ট হয়ে দরজা খুলে দিতে হয়। আর তক্ষুণি কালা বাঁদুরের মতো ছোটু ঝড়ের বেগে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বাইরে।

এদিকে শোচনীয় অবস্থা প্রমিলার। মানসিক অশান্তিতে বুকের ভিতরটা পাথরের মতো ভার হয়ে আছে। শরীরের অঙ্গ-পতঙ্গগুলিও যেন ক্রমশ অসার হয়ে আসছে। সকাল থেকে ভারাক্রান্ত মনে রান্নাঘরের চৌকাঠে হাঁটু ভাঁজ করে চুপচাপ বসেছিল। মাসের শেষ, একটা কানাকড়ি নেই ঘরে। চাল, ডাল, তেল, নুন-মশলা সবই বাড়ন্ত। হরিপদ সেই কোণ্ সকালে বেরিয়েছে। শাক-সব্জি-তরিতড়কারি নিয়ে গিয়ে বসেছে বাজারে। বেচা-বিক্রি শেষ করে কখন যে বাড়ি ফিরবে, তার নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমা নেই। এলে পরেই চূলোয় আগুন জ্বলবে, রান্না বসবে। এদিকে বেলা ক্রমশ বয়ে যাচ্ছে। এখনো পেটে কিছু পড়ে নি। সবাই ক্ষুধার্ত। ক্ষিদায় চোঁ চোঁ করছে পেট। গতকালের একটা বাশি রুটি ছিল হাঁড়িতে। ছোটকু সেটাই হনুমানের মতো আমগাছের ডালে বসে বসে চিবোচ্ছে। তা না হলে এতক্ষণে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতো। গুষ্ঠীর পিন্ডি চটকাতো।
মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে প্রমিলা ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে বসে বসে।

(২)

বেলা বারোটা বাজে প্রায়। তখনও চূলোয় আঁচ পড়েনি। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। সবাই চুপ চাপ। মুখ ভার করে আছে। কেউ কথাবার্তা বলছে না। রমলা বারান্দায় বসে বাউজ রিপু করছে। গোয়ালঘরের পাশে বসে লাউমাচা তৈরী করছে নিকুঞ্জ। উঠোনের একপাশে শুকনো নারকেল ছুলতে বসেছে প্রমিলা। ইতিমধ্যে হাতে পানদানি নিয়ে কাশতে কাশতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন প্রভাবতী দেবী। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে চারিদিকে একবার নজর বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে পড়লেন বারান্দায়। একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো আমপাতাগুলিকে পদতলে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ছোটু

আপনমনে এগিয়ে যাচ্ছিল গোয়ালঘরের দিকে। হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে নিকুঞ্জ,-"হেই, শান্ত হইয়া এক জায়গায় বহস না ক্যান? খালি বাইন্দরামি, না!" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, -"ইচ্ছা করে কি, ধইরা লাগাই দুইটা!"

ছোটু চমকে ওঠে। পরিস্থিতি বেগতিক লক্ষ্য করে বাধ্য ছেলের মতো নিঃশব্দে নিকুঞ্জর পাশে গিয়ে বসে পড়ে। কিন্তু গায়ে ফোসকা পড়ল প্রমিলার। হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সে একেবারে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জে ওঠে,-"হতচ্ছাড়া, কুলাঙ্গার, যামু কোন্ চুলোয় ক? তড়ে ঠাঁই দিবে কে! সহ্যই হয় না কারো! মানইষে চেহারা সুরত দেইখ্যা হাসে, পরিহাস করে! তবু রবাত ভালো আছিল, পোলা হইছিল, নইলে মুখই দেখাইতে পাইত্তাম না কাউরে! আমাগো পানিত ডুইব্যা মরতে হইত সবাইরে!"

পেটের ক্ষুধা সহ্য করা যায়, উপবাসে থাকা য়ায়, কিন্তু অবেলায় অকথা-কুকথা সহ্য হয় না প্রভাবতীর। তিনি হলেন সেকেলে মহিলা। সংস্কার বিশ্বাসী। সংস্কারপ্রবণ মন-মানসিকতা। ওনার ধারণা, এতে ঘর গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। একেই শরীর একখানা রোগের ডিপু, হাই ব্যাডপ্রেসার, তন্মধ্যে বাতের ব্যথা। রাতে ঘুমই হয় না ঠিকমতো। কদিন যাবৎ পা-দুটোতেও ফোলা ধরেছে। নড়তে চড়তে পারেন না, হাঁটাচলা করতে বড্ড কষ্ট হয়। মন-মেজাজ একদমই ভালো নেই। এর মধ্যে প্রমিলার কথাগুলি যেন তীরের মতো কানে এসে বিদ্ধ হলো। ক্রোধে ফুলে ওঠেন। সম্বরণ করতে পারলেন না। ফোঁস করে উঠলেন,-"কি অলক্ষুণে কথা শুরু করছ বৌমা! দুঃখ শুধু তোমার! আমাগো নাই! পোলাপাইন আমরাও মানুষ করছি! স্থান-কাল জ্ঞান আছে কিছু তোমার? হক্কল সময় হক্কল কথা কহন যায় না! কি করবা, প্যাটে ধরছ, অড়ে তো আর ফ্যালতা পারবা না! সবই ভাইগ্য! অভাব চিরকাল থাকব না! অড়ে ল্যাখা পড়া শিখাও, মানুষ কড়! ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাও! ভগবানে মুখ তুইল্যা একদিন চাইবই! শত হইলে হে তো পুরুষ মানুষ! হ্যাড় আবার দুঃখ কিসের! শুনছি, কানা ছেলেরেও মাইনষে পদ্মলোচন কয়! কথায় আছে না, সোনা ব্যাঁকা হইলেও হেইডা সোনাই, এক্কারে খাঁটি সোনা, বুঝলা বৌমা! আমাগো ছোটুও একদিন খাঁটি সোনা হইয়াই বাহির হইব, তুমি দেইখ্য! বাশি হইলেও আমার কথা একদিন লাগবই লাগব!"

কখন যে হরিপদ এসে আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কথাগুলি আড়ি পেতে শুনছিল, কেউ টের পায় নি। সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে হঠাৎ গর্জে ওঠে,-"মা, তুমি থামবা! ঐসব কইতেই সহজ, বুঝলা! পোলারে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানামু হেই ক্ষমতা আছে আমার! না হইব কুনদিন! হ্যাড় ল্যাখাপড়াই তো গোল্লায় গ্যাছে গিয়া! এক রকম ছাইড়্যাই দিছে! এত্ত বড় বড় কথা কও কেম্নে? এসব আমাগো শোভা পায়? ল্যাখাপড়া আমার বাবায় শিখাইছে কুনদিন? আমাগো ইস্কুলে দিছিল কুনদিন? চাষার পোলারে হে চাষাই বানাইছে! লাঙ্গল একখান্ ধরাই দিছে হাতে! ইস্কুলের মুখই দেখি নাই কুনদিন! তুমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাইবার কথা কও! বনের পশু-পক্ষীরাও দুইটা খাইয়া বাইচ্যা থাকে, আনন্দ করে! আমাগো তো জনমই বৃথা! মানুষ্য কূলে আইসা আমরা করছি কি! মানুষই হইতে পারি নাই! সারাটা জীবন লাঙ্গল চালাইয়া আমাগো খাইতে হইব। ভুইল্যা যাইও না, আমাগো ছোটুও চাষার পোলা, চাষাই হইব! অড়ে এত্ত বড় বড় স্বপ্ন কক্ষনো দেখাইবা না, বুঝলা, কক্ষনো না!"

চটে যান প্রভাবতী। শাড়ির আঁচলটা কোমড়ে গুঁজতে গুঁজতে উঠোনে নেমে আসেন। ভ্রু-যুগল উত্তোলণ করে বললেন,-"দ্যাখামু না ক্যান? ক্যান দ্যাখামু না কয়? তড়া রোজই অশান্তি করস! অড়ে পিটাশ! হে হাউ হাউ কইর‍্যা কান্দে! এসব দেইখ্যা চুপ থাকি কেম্নে কঅ! আমরা কেহই চিরকাল বাঁইচ্যা থাকুম না! হ্যাড় ভবিষ্যৎ কি হইব, চিন্তা করছস তোড়া!"

হরিপদ নিরুত্তর। মনে মনে ভাবল, কথায় কথা বাড়ব, তালে তাল দিব প্রমিলা। ইন্ধন যোগাইব রমলা। হ্যাড়ে উচকানি দিব নিকুঞ্জ। ব্যস, লাইগ্যা যাইব গিয়া কুরুক্ষেত্র, তর্ক-বিতর্ক! তার চে' বরং চুপ থাকাই মঙ্গল! চিন্তাই করুম না! ছোটুর কপালে যা লিখা আছে, তাই-ই হইব!
ভাবতে ভাবতে ধপ্ করে বসে পড়ে বারান্দায়।

প্রতিদিন বাজার থেকে এসে হরিপদর বিড়ি টানার অভ্যেস। অগ্নিসংযোগ করে মাত্র দুটান দিয়েছে, হঠাৎ গরুর বাছুর "এ্যাম্বে" করে ডেকে উঠতেই নজরে পড়ে, আজ ছোটুও লাউমাচা তৈরী করতে বসেছে। নিকুঞ্জকে সহযোগীতা করছে।
মনটা তৎক্ষণাৎ বিষাদে ভরে গেল। হতাশায় ফোঁস করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হরিপদ মনে মনে বলল,-"এরেই কয় অদৃষ্ট! ইস্কুলে দিয়াও পোলার ল্যাখাপড়া হইল না! অড়ে মানুষ করতে পারলাম না!"

দাঁতে বিড়ি চেপে বাঁশের খুঁটি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বলল,-"হ্যাড়ে কুঞ্জ, আজ ছোটুরেও সঙ্গে লয়া আইস ক্ষ্যাতে! অড়েও তো শিখান লাগব।"
বলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোয়ালঘরের গা-ঘেষা সরু মেঠোপথ বেয়ে হরিপদ নেমে পড়ল ক্ষেতে। তার কিছুক্ষণ পরই ক্র্যাচ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল নিকুঞ্জ। ওর পিছে পিছে কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে ছোটুও এগিয়ে গেল।

(৩)

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা বছর। ততদিনে ছোটুও বড় হয়ে উঠেছে। ক্ষেত-খামারির কাজ বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। শ্রমিক সংখ্যাও বেড়ে তিনজন হয়েছে। আনাচপাতীও প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হচ্ছে। বাজারেও বিক্রি হচ্ছে। ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল আর্থিক উন্নতি, স্বচ্ছলতা, পরিপূর্ণতা। সবাই খুশী। একমাত্র প্রভাবতী দেবীই পারেন নি খুশী হতে। ছোটুর হাতে লাঙ্গল দেখলেই রক্তের চাপ তিনগুন বেড়ে যায়। তিনি সাংঘাতিক চটে যান। কত স্বপ্ন ছিল, কত আশা ছিল, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছোটু একদিন মানুষ হবে, মা-বাবার দুঃখ মুছে দেবে, মুখ উজ্জ্বল করবে, বংশ মর্যাদা বাড়বে। কিন্তু তা হলো না। হবার সম্ভাবনাও নেই! অনবরত বকতে থাকেন,-"কি কপাল কইরা যে আইছিলি সংসারে, কত্তগুলা বান্দর পোলাপাইনের ডরে ইস্কুল ছাইরা দিছস, ল্যাখাপড়া বন্ধ কইরা দিছস! মুখ পোড়া, না খাইয়া থাকলে হ্যাড়া খাওয়াইব তড়ে! আইয়া জিজ্ঞাইবও তো না কেউ! মাও হইছে একখান, খালি চিল্লায়, কামের কাম কিচ্ছুই হয় না! কেবল আমিই হাউ হাউ কইরা মরি।"
মন্ত্রের মতো প্রতিদিন একই গাঁথা শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে সবার। কানেই তোলে না কেউ। আর ছোটু, মুখ টিপে হাসে। এক কান দিয়ে ঢোকায়, আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। মনে মনে বলে,-"হুম্! পাগলে কি না বলে, আর ছাগলে কি না খায়!"

মাঘ মাস। শীতের বেলা। রৌদ্রখড়দ্বীপ্ত উজ্জ্বল আকাশ। ঝুরু ঝুরু শীতল হাওয়া বইছে। অথচ সূর্য্যের তাপে মালুমই হচ্ছে না! কিন্তু ঠান্ডায় ঘরের ভিতর টেকা যাচ্ছেনা। একেই মাটির দেওয়াল, কপাটহীন জানালা। ঘরের মেঝেটাও ভিজা, স্যাঁতসেতে ভাব। তন্মধ্যে বাইরের শীতল বাতাস ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে জমে হীম হয়ে যাবার জোগার। ছোটু দু'হাত বোগলে গুঁজে থর্থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে

আসে বাইরে। বেরিয়েই দ্যাখে, মা-ঠাকুমা দু'জনে আমগাছতলায় বসে বসে ডালের বড়ি দিচ্ছে। দ্রুত গিয়ে বসে পড়ে সেখানে। ওর পিছে পিছে রমলা এসে যোগ দিতেই মুখ ভ্যাঙ্গিয়ে নিঃশব্দে সড়ে এলো।

নজর এড়ালো না প্রমিলার। মুখকিয়ে হাসলো। হঠাৎ পিছন ফিরতেই দ্যাখে, ছোটু আশে-পাশে কোথাও নেই। উঠোনের ডানদিকে বিরাট শাঁন বাঁধানো পুকুর। দূপুরে এই সময় জলটা বেশ পরিস্কার থাকে। ভাবল, সাঁতার দিতে নেমেছে বোধহয়। কিন্তু এতো ঠান্ডায়!
গলা টেনে দেখল, নাঃ, পুকুরেও তো নেই! তবে কোথায় গেল ছোটু!

প্রমিলা দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে দ্যাখে, বিছানায় শুয়ে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে, টেলিভিশনে ছোটু ক্রিকেট খেলা দেখছে। খুব মনযোগ দিয়েই দেখছে। ওর চোখেমুখে আবেগ, উদ্বেগ। কখনো আবার লাফ দিয়ে উঠছে। উঠবেই তো! ছোটু এখন ষোল বছরের কিশোর, ক্রিকেট খেলা ভালোই বোঝে। আর দেখতে দেখতে সেটা ক্রমশ নেশা ধরে যায়। কিন্তু শুধু দেখার জন্য নয়, ছোটু এখন নিজেই ক্রিকেট খেলবে। ইচ্ছাটা বেশ ক'দিন ধরেই ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অথচ মা-বাবাকে বলতে সাহসই পাচ্ছেনা! কিন্তু ছোটু ক্রিকেট খেলবে কেমন করে!

যা ভেবেছিল তাই, শোনা মাত্রই প্রমিলা তীব্র কন্ঠে গর্জে ওঠে,-"মুখ পোড়া, বান্দর, আমারে কি মোটেই শান্তি দিবিনি! তুই খ্যালবি কার লগে! আছে তোর কোনো বান্ধব!"
পরক্ষণেই নরম হয়ে বলল,-"সক্কাল সক্কাল জ্বালাস নে বাবা! খ্যালতে লাগব না! বল ছুইট্যা মাইনষের গায়ে পড়ব, হ্যাড়া চিল্লাচিল্লি করব! গালি দিব! যা বাবা, যা, ঘরে গিয়া টি.ভি দ্যাখ গে যা!"

ছোটু নাছোরবান্দা। মায়ের মুখে মুখে তর্ক করে,-"কাউকে লাগবে না। আমি একাই খেলবো! আমাকে পয়সা দাও!"
শুনে হাঁ করে থাকে প্রমিলা। -"পোলায় কয় কি! ক্রিকেট খ্যালা তুই কিছু বুঝস! তড় বাবায় খ্যালছে কুনদিন!"

ছোটু গ্রাহ্যই করল না। হাতটা বারিয়ে বলল, -"দাও, দাও! শীগগির পয়সা দাও!"

সবিস্ময় প্রমিলা বলল, -"পয়সা, পয়সা কি গাছে ধরে? করবি কি পয়সা দিয়া? "

-"ব্যাড-বল কিনবো!"

-'খ্যালা পাইছস! কত্ত কষ্টের পয়সা! মানুষডা রাইত দিন খাইটতাছে! বিছানায় পড়লে দ্যাখব কে! কইস তড় বাপরে! দিবে ধইরা! যত্তসব আজগুবি বায়না!" বলে এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না। গজ গজ করতে করতে এগিয়ে গেল পুকুরঘাটের দিকে।

ছোটু একরোখা ছেলে। পয়সা ও' নেবেই! ছুটে যায় ঠাকুমার কাছে। শাড়ির আঁচলের গিটটা খুলে কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে প্রভাবতী দেবী বললেন,-"ঘুম থিকা উইঠ্যাই শুরু করছস! মায়ে দিব তড়ে কুনদিন!"

ততক্ষণে টাকাটা বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে নিয়ে ছোটু দেয় দৌড়। বাজারে গিয়ে ক্রিকেট খেলার সব সরঞ্জাম কিনে নিয়ে আসে। ওর স্বপ্ন ছিল, ক্রিকেটা খেলবে, ভালো প্লেয়ার হবে। কিন্তু খেলতেই পারছে না! একা একা কেমন করে ও' খেলবে!

মনের দুঃখে অভিমানে ব্যাড্ আর বল দুহাতে বুকে নিয়ে ছোটু ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ্ করে বসে বসে কাঁদে। ওকে দেখতে পেয়ে প্রভাবতী বললেন,-"কি হইল আবার! কাঁন্দস্ ক্যান! কেম্নে খ্যালে জানস না? ব্যাড্‌টা দিয়া বলটারে লাগা কয়খান বারি! বল ছুইট্টা পালাইব! পয়সা দিসি কি কাঁন্দনের লাইগ্যা! যা, উঠ!"

ছোটুকে অনুপ্রাণিত করলেন প্রভাবতী দেবী। ওও উঠোনের এমাথা ওমাথা বলের পিছে পিছে দৌড়ায়। মনে মনে খুব আনন্দ পায়। নিশ্চিন্ত হয় হরিপদ। ছেলেকে উৎসাহিত করে। সঙ্গ দেবার চেষ্টা করে। ছেলেও বাপকে পেয়ে খুব খুশী। ছোটু ব্যাড্ ধরে থাকে, হরিপদ দূর থেকে চুটে এসে বল ছুঁড়ে মারে। খেলা ক্রমশ জমে ওঠে। তারপর থেকে প্রতিদিন বিকেল হলে শুরু হয় ক্রিকেট খেলা।
দেখতে পেয়ে পাড়ার ঝন্টু, আবদুল, করিম, পান্না, ছোকু, নিতাই, রহিম, মন্টি সবাই ছুটে আসে, করতালি দিয়ে ওঠে। উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। কেউ কেউ সদিচ্ছায় খেলার জন্য এগিয়ে আসে। ছোটু সানন্দে সবাইকে টেনে নেয় ওর দলে। ক্রিকেট খেলা পুরোদমে মেতে ওঠে।
তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল ক্রিকেট খেলার পুর্ণ একটি দল। পালা করে প্রতিটি গ্রামে খেলার আমন্ত্রণে ছোটু ভুলে গেল, অতীতে ভাগ্যবিড়ম্বণায় পদে পদে অপদস্থ, তিরস্কার, অপমান ও অপবাদের দিনগুলির কথা! ভুলে গেল, দারিদ্রপীড়িত জীবনের কঠোর দুঃখ-দীনতার কথা! যখন ও' পরিণত হয়, একজন অভিজ্ঞসম্পন্ন সমঝদার ক্রিকেট প্লেয়ার। প্রশংসিত হয় সারা গ্রামে। শুনে বিস্মিত হলেন, গ্রামীণ পাঠশালার হেড্ মাষ্টার ঘোষাল মশাই এবং শহরাঞ্চলের বিধাননগর এলাকার বয়েজ-ক্লাবের বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচে অংশ গ্রহণের জন্য পুরো টিম সমেত ছোটুকে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। এ কি কম কথা!

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে প্রমিলা। -"ওগো, পোলায় কয় কি শুনো!"

বারান্দায় বসে বিড়ি টানছিল হরিপদ। বলল,-"পোলায় নয় গো গিন্নী, গ্যারামের মাষ্টারে ডাইক্যা কইছে অড়ে! হেই পঞ্চায়েতরে ধইর‍্যা সব ব্যবস্থা করছে! জানো কিছু!"

স্বপ্নের মতো মনে হয় প্রমিলার।-এত্তসব সম্ভব হইলো কেম্নে! পোলায় তাহলে সত্যিই ক্রিকেট খ্যালতে জানে! শিখছে কিছু!

তবু যেন বিশ্বাস হয়না। বিস্ময়ে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়ছিল, হঠাৎ অব্যক্ত আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। অনুতাপে অনুতপ্ত হয়। -আহা রে! পোলা আমার কত্ত কষ্ট পাইছে! কত্ত গালি দিছি অড়ে! মাইরও খাইছে অনেক! কত্ত চোখের পানি ফ্যালছে!

বুকটা ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠতেই ছোটুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে প্রমিলা। ওদিকে খুশীতে আটখানা প্রভাবতী দেবী। ঠোঁটদু'টো চিবিয়ে চিবিয়ে সহাস্যে বলে,-"কি বৌমা, কি কইছিলাম! কতায় আছে না, সবুরে মোয়া ফলে! আজ ফলছে গো ফলছে!"

ঠাকুমার গলা পেয়ে ছোটু দরজার কোণে লুকিয়ে পড়ে। নজর এড়ায় না প্রভাবতী দেবীর। পিছন থেকে খপ্ করে ওর জামাটা টেনে ধরে বলে,-"ওই মুখপোড়া, কোই গ্যালি তুই! আয়, তোড়ে একটু দেখি!"
ততক্ষণে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে ছোটু কোলে তুলে নিয়ে বলে,-"হুড়রে!"

কিন্তু কখনো কি কল্পনা করেছিল, ছোটু একদিন বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করবে! দেশ-বিদেশ ঘুরবে! স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল কেউ, হত-লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, নিপীড়িত ছোটু বিশ্বকাপ ক্রিকেট চাম্পিয়ান হবে! নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করবে! কিন্তু ভাগ্যের লিখন রোধ করা সাদ্য কার!
মিরাকলের মতো প্রথম প্রয়াসেই একদিন তাই ঘটে গেল ছোটুর জীবনে। যেদিন গ্রামীণ হেড্ মাষ্টার ঘোষাল মশাই-এর রিকমেন্ডে ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নিয়ে প্রথম দিনেই বিরোধী দলকে একশ ত্রিশ রানে পরাজিত করে ছোটু জিতে নেয় জীবনের প্রথম পুরস্কার এবং ভূষিত হয়, দ্যা বেষ্ট ক্রিকেট প্লেয়ার।
ছোটু রাতারাতিই বিখ্যাত হয়ে সব বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে গেল। চারিদিকে ওর জয়জয়কার। গ্রাম থেকে ছড়িয়ে পড়ে শহরে, শহরের অলিতে-গলিতে, প্রতিটি ক্রিকেট ভক্তদের অন্তরে।
আর সেদিন থেকেই দেখা দিলো জীবনের আমূল পরিবর্তন। বিস্ময়ে হতবাক, আবেগে অভিভূত ছোটুর মাতা-পিতা, ঠাকুমা, কাকা, পিসি, গ্রামের সবাই! নতুন করে শুরু হয়, বিদ্যাপাঠের আয়োজন, কোচিং ক্লাস। মনোযোগ আরো বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্কস পাবার ইচ্ছানুভূতির তীব্র জাগরণে জীবনে উত্তীর্ণ ও বড় হবার স্বপ্ন ছোটুর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যেদিন উচ্চাকাঙ্ক্ষিত বাসনাগুলিকে বাস্তবায়িত করবার প্রত্যয় নিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস, মনের শক্তি, নিরলস সাধনায় নিমগ্ন হয়ে অনায়াসে পৌঁছে যায়, সাফল্যের প্রবেশদ্বারে। আর তখনই মন্ত্রের মতো ঘুরে গেল, ছোটুর ভাগ্যের চাকাটা। মুছে গেল পূঞ্জীভূত সমস্ত গ্লানি। মিটে গেল দারিদ্র্যের কঠোর যন্ত্রণা। প্রত্যেক বছর স্কলারশীপ্ আর একের পর এক খ্যাতনামা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে জন্মদাতা মাতা-পিতা, ঠাকুমা, পিসি, কাকা সহ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-প্রফেসর সকলকে আত্ম গর্বে গর্বিত করে তোলে। শুধু তা নয়, সকলের মন জয় করে কুড়িয়ে নেয় তাদের স্নেহ-ভালোবাসা এবং আর্শীবাদ।

তারপর ছোটুকে পিছন ফিরে আর তাকাতে হলো না। ধাপে ধাপে একের পর এক সৌভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে পোঁছে যায় জীবনের চরম সাফল্যের স্বর্ণশিখরে।

ছোটু আজ সারা বিশ্বে স্বনামধন্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট চাম্পিয়ান বিশ্বজিৎ চৌধুরী নামে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পঁচিশ বছরের তরুণ যুবক। বিশ্ব বিখ্যাত যার নাম, যশ এবং পদোন্নতির স্রোতে হারিয়ে গেল, শৈশব ও কৈশোরের অতি নগন্য নিগৃহীত, নিপীড়িত, হতভাগ্য সেই ছোটু। আজ যেন ওর নতুন করে জন্ম হলো। আর তারই শুভার্থী ভক্তরা বিজয়মাল্য হাতে নিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে ভীঁড় জমিয়েছে শহরের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। বিশ্ব বিজয়ী ক্রিকেট চাম্পিয়ান বিশ্বজিৎ চৌধুরী আজ ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছে, এ কি কম আনন্দের কথা! কম সৌভাগ্যের কথা! কম গৌরবের কথা!

আবেগে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে প্রমিলা। আনন্দে আত্মহারা হরিপদ। ছোটুকে দেখবার জন্য সবাই অস্থীর হয়ে ওঠে। যার পর্দাপণে হরিপদর অন্ধকার ঘুপচি ঘরে জ্বলে উঠবে একরাশ উজ্জ্বল দ্বীপ্তিময় আলো। এ যেন মরা গঙ্গায় বান! যেন শুকনো নদীর বুকে জোয়ার জলে কানায় কানায় ভেসে যাওয়ার মতো!

লোকে লোকারণ্য। বিমান বন্দরে অগণিত ভক্তদের ভীঁড়। পা ফেলার জায়গা নেই। হঠাৎ শত সহস্র লোকের ভীঁড় ঠেলে প্রভাবতী দেবী সাশ্রু নয়নে এগিয়ে এসে সগৌরবে বলে উঠলেন,-"প্যাটে সোনাই ধরছিলা বৌমা! তোমরা বুঝ নাই! ছোটু আমাগো সত্যিই খাঁটি সোনা!"

পিছন থেকে ছোটুর বন্ধু ভোলা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে,-"সোনা নয়গো দাদী, বলো হীরে! ছোটু তোমাদের হীরের টুকরো ছেলে!"

ছোটুকে বুকে টেনে নিয়ে ওর চিবুকটা ধরে প্রভাবতী দেবী বললেন,-"কই দেখি, আমার দাদাভাই-এর মুখখান একবার দেখি! এইবার শীগগির একখান্ সুন্দর লাল টুকটুকে বৌ আইন্যা দিমু তড়ে!"

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
jbarua1126@gmail.com